জলকন্যা

হুমায়ূন আহমেদ

জলকন্যা

হুমায়ূন আহমেদ

সময় প্রকাশন

জলকন্যা
হুমায়ূন আহমেদ
© গুলতেকিন আহমেদ

সপ্তম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০২
ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৯৬
২য়-৪র্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
দ্বাদশ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৪
একাদশ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দশম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২
নবম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৯
অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৭

সময়

সময় ১০১

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সমর মজুমদার

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল ঢাকা

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

JALKANNAY (Collection of Short Stories) by Humayun Ahmed. First Published : February Book Fair 1996, 12th Print in April 2014 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.

Website : www.somoy.com Email : info@somoy.com

Price : Tk. 120.00 Only

ISBN 984-458-101-X Code: 101

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : 'সময় . . .' প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

সূচীপত্র

জলকন্যা	০৭
পাপ	২০
সংসার	২৬
ব্যাধি	৩১
জনক	৩৯
চোর	৪৫
শৃঙ্খলা	৫১
কবর	৫৫
লাবাম্বা	৬৩
একজন শৌখিনদার মানুষ	৬৯
আঙুল	৭৪
ছুনু মিয়া	৮৩
চোখ	৯০

জলকন্যা

রাত আটটার দিকে বীনুর মনে হল সে একটা ভুল করেছে। ছোটখাটো ভুল না, বড় ধরনের ভুল—মনিকার জন্মদিনে তার আসা ঠিক হয়নি। মনিকা তার এমন কেউ না যে তার জন্মদিনে আসতেই হবে। তাছাড়া মনিকা তাকে সেভাবে দাওয়াতও করেনি। ভদ্রতা করে বলেছে। মনিকা তার জন্মদিনের কথা নীতুকে বলছিল, সেই সময় বীনুর দিকে তাকিয়ে বলল, বীনু তুমিও এসো। বীনু তৎক্ষণাৎ হ্যাংলার মত বলেছে—'আচ্ছা।' এটা যে নিতান্তই কথার কথা তাও বুঝেনি।

মনিকা বলেছে, পার্টিতে যারা আসবে তাদের কিন্তু সারারাত থাকতে হবে। সারারাত আমরা হৈ চৈ করব। তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?

বীনু বলল, না, অসুবিধা হবে না।

অথচ তার ভয়ঙ্কর অসুবিধা হবে। তাদের বাসা এরকম না যে ঊনিশ বছর বয়েসী মেয়েকে রাতে অন্য বাড়িতে থাকতে দেবে। তার নামে বাসায় কোন চিঠিপত্র এলে তার হাতে দেয়া হয় না, আগে বীনুর মা মনোয়ারা খুলে পড়েন। পড়ার পর যদি মনে হয় সাধারণ চিঠি তবেই তার হাতে দেয়া হয়। সাধারণ চিঠিতেও সমস্যা আছে। তার এক বান্ধবী সুরমা, ক্লাস টেনে পড়ার সময়ই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, সে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল সেতাবগঞ্জ নামের একটা জায়গায়। সেখান থেকে সে মাসে দু'টা তিনটা করে চিঠি লিখতো। মনোয়ারা একদিন বললেন, মেয়েটা এত চিঠি লেখে কেন? ঘন ঘন চিঠি লেখার দরকার কি?

বীনু অবাক হয়ে বলল, চিঠি লিখলে অসুবিধা কি মা?

মনোয়ারা থমথমে গলায় বললেন, অসুবিধা আছে, তোর বাবা রাগ হয়। 'বাবা রাগ হয়'—এর উপর কথা চলে না। বীনুদের সংসার তার বাবা ইদ্রিস আলির চোখের ইশারায় চলে। ইদ্রিস আলি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। রোগা পটকা মানুষ, থুতনীতে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটার মত দাড়ি আছে। নিতান্তই সাধারণ চেহারার একজন মানুষ। অথচ সেই সাধারণ চেহারার মানুষের চোখের ইশারার বাইরে যাবার সাহস কারো নেই। বীনুর ছোট ভাই জহির কলেজে ভর্তি হবার পর একবার সাহস দেখালো, বাসায় ফিরল রাত সাড়ে এগারোটায়। তার এক বন্ধুর বাসায় নাকি দাওয়াত ছিল। বাসায় ফিরেই সে

নিজের ঘরে ঢুকে তাড়াহুড়া করে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। তখন ইদ্রিস সাহেব ছেলের ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। কোমল গলায় বললেন, জহির ওঠ (ইদ্রিস সাহেবের গলার স্বর খুবই কোমল)। জহির ধড়মড় করে উঠে বসলো। জহির সাহেব বললেন, কোথায় ছিলি?

বন্ধুর বাসায় দাওয়াত ছিল।

খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করেছিস?

জ্বি।

কি খাওয়ালো?

পোলাও আর খাসির রেজালা।

বোরহানি ছিল না?

জ্বি না।

গরমের মধ্যে বোরহানি দেয়া তো উচিত ছিল। রিচ ফুড বোরহানি ছাড়া হজম হবার কথা না। খাওয়া-দাওয়ার পর মিষ্টি পান খাস নাই?

জ্বি খেয়েছি।

সিগারেট খাস নাই? মিষ্টি পানের সাথে তো সবাই সিগারেট খায়। তুই খাস নাই?

জ্বি না।

আমিতো গন্ধ পাচ্ছি। দেখি হা করতো, বড় করে হা কর। আরো বড়। এখন নিঃশ্বাস ফেল।

জহির নিঃশ্বাস ফেলল এবং কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আর কোনদিন খাব না বাবা। ইদ্রিস সাহেব মধুর গলায় বললেন—খাবি না কেন, অবশ্যই খাবি। বন্ধুবান্ধব আগ্রহ করে দেয়, না খেলে ওরা মনে কষ্ট পাবে। কারো মনে কষ্ট দেয়া ঠিক না। আচ্ছা এখন নাম বিছানা থেকে।

জহির বিছানা থেকে কাঁপতে কাঁপতে নামলো।

সার্ট গায়ে দে।

জহির সার্ট গায়ে দিল।

ইদ্রিস সাহেব বললেন, যা এখন বাসা থেকে চলে যা। তোকে আর পুষব না। তুই আমাকে বাপ ডাকবি তার জন্যে তোকে পোষার দরকার দেখি না। ঢাকা শহরে শত শত লোক আছে যাদের তিনবেলা ভাত খাওয়ালে খুশি মনে আমাকে বাপ ডাকবে।

জহিরকে অবশ্যই সে রাতে বাসা ছাড়তে হত যদি না ইদ্রিস সাহেবের মা ভাগ্যক্রমে বাসায় থাকতেন। এই ভদ্রমহিলার বয়স সত্তরের উপর। চোখে দেখতে পান না। কিন্তু কান খুব পরিষ্কার। হাঁটা চলা করতে পারেন। হৈ চৈ শুনে তিনি দেয়াল ধরে ধরে বের হয়ে এলেন এবং তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আবু কি হইছে?

ইদ্রিস সাহেব বললেন, কিছু না মা, ঘুমান।

বাসাত থাইক্যা কারে বাইর করতাছস?

আম্মা আপনে ঘুমান।

আমি জীবিত থাকতে তুই আমার নাতিরে রাস্তায় বাইর কইরা দিবি, তোর সাহসতো কম না। সাহস বেশি হইছে?

কাউরে বাইর করতেছি না।

এইটা ভাল কথা।

থুরথুরি বুড়ি বিছানায় শুতে গেলেন। তবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণই কথা বলতে লাগলেন—সিগারেট খাইছে তো কি হইছে? তার বয়সে তুই বিড়ি খাইচস। নিজের বাপের মাইর তোর মনে নাই। বাপগিরি ফলাস। অত বাপগিরি ভাল না।

বীনুর ভরসা তার দাদীজান। দাদীজান এখন তাদের বাসায় আছেন। তিনি পালা করে তার চার ছেলের বাসায় তিন মাস করে থাকেন। রোজার ঈদ পর্যন্ত বীনুদের সঙ্গে থাকার তারিখ পড়েছে। দাদীজানকে দিয়ে বাবার অনুমতি বের করে নেয়া খুব সমস্যা হবে না বলেই বীনুর ধারণা। বীনুর খুব শখ মনিকার সঙ্গে একটা রাত কাটায়। এত সুন্দর একটা মেয়ে আর এত বড়লোক। ওদের বাড়িটাও নিশ্চয়ই দেখার মত হবে। বীণুর ক্ষীণ আশা একটা রাত থাকলে মনিকার সঙ্গে তার ভাব হতে পারে। এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব হওয়াও ভাগ্যের কথা। মনিকা যাদের সঙ্গে ঘুরে বীনু দূর থেকে তাদের দেখে, তাদের চালচলন কথাবার্তা সবই অন্য রকম। সেদিন মনিকারা চারজন (ওরা চারজন সব সময় এক সঙ্গে থাকে। সেই জন্যে ওদের নাম হয়েছে চতুর্ভুজ)। ওয়াদুদ স্যারের ঘরে ঢুকে পড়ল। মনিকা তখন স্যারের রুমে। সে গেছে তার পার্সেন্টেজ দিতে। দেরিতে ক্লাসে এসেছিল বলে পার্সেন্টেজ দিতে পারেনি।

ওয়াদুদ স্যার বললেন, কি ব্যাপার, চতুর্ভুজ এক সঙ্গে? মনিকা হাসি মুখে বলল, আপনি স্যার কফি বানিয়ে খান। রোজ এত সুন্দর গন্ধ পাই। আজ আমাদের কফি খাওয়াতে হবে।

বেশতো, কফি খাও।

ওয়াদুদ স্যার বেয়ারাকে কফি বানাতে বললেন। বীনু মুগ্ধ হয়ে গেল মেয়ে চারটার সাহস দেখে।

আরেকবার বীনু সাবসিডিয়ারী ক্লাসের শেষে বেরুচ্ছে। একটা বদ ছেলে ভিড়ের অজুহাতের সুযোগে বীনুর বুকে হাত দিল। বীনু লজ্জা এবং ভয়ে প্রায় জমে গেল। মনিকা ছিল তার পেছনে। সে ছেলেটার সার্ট খামছে ধরে বলল, তুমি ওর গায়ে হাত দিলে কেন? চারদিকে ভিড় জমে গেল। বীনু প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি। মনিকা, ওকে ছেড়ে দাও।

মনিকা শীতল চোখে কিছুক্ষণ বীনুর দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। মনে মনে সে নিশ্চয়ই বীনুর মুখে থু থু দিয়েছে। বীনুর দিকে তাকাতেও নিশ্চয়ই তার

পাপ

ভাই আপনাকে একটা ভয়ংকর পাপের গল্প বলি। পাপটা আমি করেছিলাম। নিজের ইচ্ছায় করিনি। স্ত্রীর কারণে করেছিলাম। স্ত্রীদের কারণে অনেক পাপ পৃথিবীতে হয়েছে। মানুষের আদি পাপও বিবি হাওয়ার কারণে হয়েছিল। আপনাকে এই সব কথা বলা অর্থহীন। আপনি জ্ঞানী মানুষ, আদি পাপের গল্প আপনি জানবেন না তো কে জানবে। যাই হোক মূল গল্পটা বলি।

আমি তখন মাধবখালি ইউনিয়নে মাস্টারী করি। গ্রামের নাম ধলা। ধলা গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। নতুন বিবাহ করেছি। স্ত্রী সঙ্গে থাকেন। আমার বয়স তখন পঁচিশের মত হবে। আমার স্ত্রী নিতান্তই বালিকা। পনেরো-ষোলমত বয়স। ধলা গ্রামে আমরা প্রথম সংসার পাতলাম। স্কুলের কাছেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে আমার টিনের ঘর। আমরা সুখেই ছিলাম। ফুলির গাছগাছালির খুব শখ। সে গাছপালা দিয়ে বাড়ি ভরে ফেলল। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি ফুলি আমার স্ত্রীর ডাক নাম। ভাল নাম নাসিমা খাতুন।

বুঝলেন ভাই সাহেব, ধলা বড় সুন্দর গ্রাম। একেবারে নদীর তীরে গ্রাম। নদীর নাম কাঞ্চন। মাছ খুবই সস্তা। জেলেরা নদী থেকে ধরে টাটকা মাছ বাড়িতে দিয়ে যায়। তার স্বাদই অন্য রকম। পনেরো বছর আগের কথা বলছি। এখনো সেখানকার পাবদা মাছের স্বাদ মুখে লেগে আছে। শীতের সময় বোয়াল মাছ থাকতো তেলে ভর্তি।

ধলা গ্রামের মানুষজনও খুব মিশুক। আজকাল গ্রাম বলতেই ভিলেজ পলিটিক্সের কথা মনে আসে। দলাদলি মারামারি কাটাকাটি। ধলা গ্রামে এই সব কিছুই ছিল না। শিক্ষক হিসেবে আমার অন্য রকম মর্যাদা ছিল। যে কোন বিয়ে শাদীতে আদর করে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেত। গ্রাম্য সালিসীতে আমার বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হতো। দুই বছর খুব সুখে কাটলো। তারপরই সংগ্রাম শুরু হল। আপনারা বলেন স্বাধীনতা যুদ্ধ। গ্রামের লোকের কাছে সংগ্রাম।

ধলা গ্রাম অনেক ভিতরের দিকে। পাক বাহিনী কোন দিন ধলা গ্রামে আসবে আমরা চিন্তাই করিনি। কিন্তু জুন মাসের দিকে পাক বাহিনীর গানবোট কাঞ্চন নদী দিয়ে চলাচল শুরু করলো। মাধবখালী ইউনিয়নে মিলিটারি ঘাঁটি করলো। শুরু করলো

অত্যাচার। তাদের অত্যাচারের কথা আপনাকে নতুন করে বলার কিছু নাই। আপনি আমার চেয়ে হাজার গুণে বেশি জানেন। আমি শুধু একটা ঘটনা বলি। কাঞ্চন নদীর এক পাড়ে ধলা গ্রাম, অন্য পাড়ে চর হাজরা। জুন মাসের ১৯ তারিখ চর হাজরা গ্রামে মিলিটারির গানবোট ভিড়লো। চর হাজরার বিশিষ্ট মাতবর ইয়াকুব আলী সাহেব মিলিটারীদের খুব সমাদর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ভাই সাহেব, আপনি এর অন্য অর্থ করবেন না। তখন তাদের সমাদর করে নেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সবাইর হাত-পা ছিল বাঁধা। ইয়াকুব আলী সাহেব মিলিটারীদের খুব আদর যত্ন করলেন। ডাব পেড়ে খাওয়ালেন। দুপুরে খানা খাওয়ার জন্যে খাসি জবেহ করলেন। মিলিটারীরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলো। খানাপিনা করলো। যাবার সময় ইয়াকুব আলী সাহেবের দুই মেয়ে আর ছেলের বউকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আর তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এখন গল্পের মত মনে হয়। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য। আমার নিজের দেখা। সেই দিনের খানায় শরিক হওয়ার জন্যে ইয়াকুব আলী সাহেব আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। নিয়ে যাবার জন্যে নৌকা পাঠিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলাম।

চর হাজরার ঘটনার পরে আমরা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম। গজবের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মসজিদে কোরআন খতম দেয়া হলো। গ্রাম বন্ধ করা হল। এক লাখ চব্বিশ হাজার বার সুরা এখলাস পাঠ করা হল। কি যে অশান্তিতে আমাদের দিন গিয়েছে ভাই সাহেব, আপনাকে কি বলব। রাতে এক ফোটা ঘুম হতো না। আমার স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা। সাত মাস চলছে। হাতে নাই একটা পয়সা। স্কুলের বেতন বন্ধ। গ্রামের বাড়ি থেকে যে টাকা পয়সা পাঠাবে সে উপায়ও নাই। দেশে যোগাযোগ বলতে তখন কিছুই নাই। কেউ কারো খোঁজ জানে না। কি যে বিপদে পড়লাম। সোবহানাল্লাহ।

বিপদের উপর বিপদ—জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনী দেখা দিল। নৌকায় করে আসে, দুই একটা ফুটফাট করে উধাও হয়ে যায়। বিপদে পড়ি আমরা। মিলিটারী এসে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালায়ে দিয়ে যায়। মুক্তিবাহিনীর তখন আর কোন নাড়াচাড়া পাওয়া যায় না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অবস্থার পরিবর্তন হল। মুক্তিবাহিনী তখন শুধু আর ফুটফাট করে না। রীতিমত যুদ্ধ করে। ভাল যুদ্ধ। বললে বিশ্বাস করবেন না, এরা কাঞ্চন নদীতে মিলিটারীর একটা লঞ্চ ডুবায়ে দিল। লঞ্চ ডুবার ঘটনা ঘটলো সেপ্টেম্বর মাসের ছাব্বিশ তারিখ। স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল। ভাই সাহেব হয়তো শুনেছেন। বলা হয়েছিল শতাধিক মিলিটারীর প্রাণ সংহার হয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক না। মিলিটারী অল্পই ছিল। বেশির ভাগই ছিল রাজাকার। রাজাকারগুলা সাঁতরে পাড়ে উঠেছে, গ্রামের লোকরাই তাদের পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস ভাই সাহেব। যুদ্ধ অত সাধারণ মানুষকেও হিংস্র করে ফেলে। এটা আমার নিজের চোখে দেখা।

এখন মূল গল্পটা আপনাকে বলি। সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখের ঘটনা। মাগরেবের নামাজ পড়ে বারান্দায় বসে আছি। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে। ইংরেজীতে যাকে বলে